দলিতের ধর্ম : ইহবাদী দেহ সাধনা

আশিস হীরা*

ভারতীয় প্রেক্ষিতে দলিত ভাবনার উৎস নিহিত রয়েছে হিন্দু সমাজের জাতপাত ব্যবস্থার গঠন কাঠামোর মধ্যে। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে সমাজ এবং রাষ্ট্রের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে, তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা সমর্পণ করবেন এমন ধারণা বাস্তব সম্মত নয়। বর্ণাশ্রমী কাঠামোয় গুণ ও কর্ম বিভাগ অনুসারে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণগণই নিয়ন্ত্রক। সমাজ কী করে চলবে এই নির্দেশিকা তারা তৈরি করেছেন নিজেদের সুবিধা মত। শাস্ত্রকে করা হয়েছে প্রধান হাতিয়ার। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আধিপত্যের সুরক্ষায় ব্রাহ্মণকৃত গ্রন্থাদির শাস্ত্রীয় বিধানের প্রয়োগের দায়িত্ব দেশরক্ষক তথা রাজন্যবর্গের উপর। এভাবে ধর্ম এবং রাষ্ট্র যুথবদ্ধভাবে শূদ্র আখ্যাধেয় দলিতবর্গের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল অস্পৃশ্যতার বোঝা। যুগ যুগ ধরে সেভাবে বহন করে চলেছে অস্পৃশ্য তথা দলিত সম্প্রদায়।

আমরা যখন স্বগর্বে মন্ত্র উচ্চারণ করি অন্ধকার থেকে আলোকে চল, অসত্য থেকে ধাবিত হও সত্যের পথে, মৃত্যু থেকে যাত্রা হোক অমৃতলোকের পথে। তখনও সমাজে জাতপাতের ভেদরেখা রক্ষা করছি সযতনে। ব্রাত্য, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ বলে দূরে রাখছি এক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে। শাস্ত্রীয় ধর্ম অতিপ্রকৃত ও দেবনির্ভরতা প্রধান। অলৌকিকতা, শাস্ত্র পুরাণের নীতি নির্দেশ ও পুরোহিত তন্ত্রের প্রাধান্য উচ্চধর্মের মূল পরিচয়। পৌরাণিক বোধাশ্রিত সনাতন ধর্ম, যার ছত্রছায়ায় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র তার সর্বব্যাপি প্রভাব দিয়ে নিম্নশ্রেণির মানুষ ও লোকসমাজকে উপেক্ষা ও বঞ্চিত করে রেখেছে। নিষ্পেষণের এই পাষাণ ভার চাইলেই লঘু করে দেওয়া যায় না, সহজে ভাগ করে নেওয়া যায় না অপরের সঙ্গে। দলিত মানুষ তাই আশ্রয় খোঁজেন নিভৃত মানসিক পরিসরে। এই বঞ্চনার চরম সীমায় পৌঁছে তারাই আবার প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। এই প্রতিবাদ চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভাবনা ও ধর্মমতকে কেন্দ্র করে। যুগসংকটের বিশিষ্টপর্বে আবির্ভূত হয়েছেন

---

* দলিত গবেষক ও সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমি

বহু ধর্মাবতার বা লোকোত্তর যুগপুরুষ।

উৎপত্তির কারণ যাই হোক না কেন বাংলার লোক সমাজের এই ধর্মগুলির সৃষ্টি যে অন্ত্যজ সমাজের ভেতর থেকে তাতে কোনও দ্বিমত নেই। এক চৈতন্যদেবকে বাদ দিলে আশ্চর্যজনকভাবে অভিজাত সমাজের প্রায় সকল ধর্ম গুরুই ব্রাহ্মণ্য মূল্য বোধের পৃষ্ঠপোষক। অন্ত্যজরাই এর ব্যতিক্রম। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। মনীষী দাদু ছিলেন চর্মকার শ্রেণির, কবির জোলা বা তাঁতি। আসামের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রবক্তা শঙ্করদেব শূদ্র। সকলেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী।[১] লৌকিক উপাসকদের জীবনের অতি গভীরে ধর্মের আসন পাতা। এ ধর্মকে প্রয়োগের মাধ্যমে, অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করতে হয়। প্রচলিত ধর্মগুলির মূল্যবোধের প্রায় বিপরীতে এদের অবস্থান। নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে হয় ধর্ম সাধনার অগ্রগতি। সমজাতীয় সাধকগোষ্ঠীর মধ্যে গড়ে ওঠে স্বেচ্ছামূলক ঐক্য। লিঙ্গ জাত বর্ণ এখানে বাধা নয়। চর্যাচর্যের ভিন্নতায় এখানে 'স্বজাতীয়' এবং বিজাতীয় সাধক চিহ্নিত হয়। প্রচলিত ধর্ম গোষ্ঠীর খ্যাদ্যাখাদ্য, বেশবাস, চর্যচর্যকে এরা অনুসরণ না করে অবৈদিক বেসরা বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। অস্তিত্বহীন অবাস্তব কল্পনানির্ভর শাস্ত্রধর্মকে এ পথের সাধকেরা বলেন অনুমান, আর নিজেদের পরীক্ষিত ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ জগৎকে বলেন বর্তমান। জীবন্ত মানুষ, সাধন-সিদ্ধ গুরু, ইহলোক, দেহ, সুখ-আনন্দ প্রেম এ মতাদর্শের[২] কেন্দ্রবিন্দু।

ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রীয় ধর্মের বাইরে বিশাল সংখ্যার মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মাচরণ বহন করে চলেছে। এর মধ্যে তারা খুঁজে যাচ্ছে আদিম সংস্কৃতি। চন্ডাল, যুগী, ডোম, বাউরি, হাড়ি, পোদ সহ অসংখ্য গৌণ গোষ্ঠী জীবনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে অন্বেষণ করে। আপনার অভিজ্ঞতাকে যুক্ত করতে চায় বৃহত্তর জগতের সঙ্গে। অথচ এরাই হিন্দুধর্মের একেবারে নিচের তলায় স্থান পায় এবং অন্ত্যজ শ্রেণির বলে চিহ্নিত হয়। তারা সর্বপ্রকার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এই বঞ্চনাকে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই পাকাপোক্ত ও অপরিবর্তনীয় করে রাখা হয়েছে। পুরোহিত শক্তি ও রাজ শক্তির দমন-পীড়ন যত ভাবেই চলুক না কেন, লোক সাধারণ তার নিজস্ব ধর্ম চেতনাকে কখনও পরিত্যাগ করেনি। উচ্চবর্গের ক্ষমতাধরদের হাত থেকে নিজেদের ধর্ম সাধনাকে রক্ষা করতে সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়েছে। অনেক কিছুকেই বাইরের লোকের কাছে গোপন রাখতে কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে—

''আপন সাধন কথা
না কহিও যথা তথা
আপনার আপনি তুমি হইও সাবধান।" (বাউল সঙ্গীত / সম্পা. সাধন দাস, পৃ. ৬৮)

তাদের ধর্মমত গুলি ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং বেশির ভাগের মূলে ছিলেন একজন প্রবর্তক। এই প্রবর্তকদের নামেই এক একটি ধর্মমত গড়ে ওঠে। এদের একটি লম্বা তালিকা পাওয়া যায়। এই তালিকায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নাম উঠে আসে। নবদ্বীপচন্দ্র গোস্বামী বিদ্যারত্নের লেখা 'বৈষ্ণব ব্রতদিন-নির্ণয়' বই-এ সে সব গৌণ ধর্মের নাম উল্লিখিত হয়েছে তা নিম্নরূপ: ''স্বাধিবধনী পন্থী, খুশি বিশ্বাসী, রাধাশ্যামী জগবন্ধু ভজনীয়া, রৈদাসী, সেনপন্থী, রামসহেনী, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলরামভজা রূপকবিরাজি,

রামবল্লভী, হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী, তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী, রাধাবল্লভী, হরিশ্চন্দ্রী, মাধবী, চুহড়পন্থী, কুড়াপন্থী, জগমোহনী, গুরুদাসী, বৈষ্ণবী, রামপ্রসাদী, চামার বৈষ্ণব হরিরামী, দরিয়াদাসী, ফকির দাসী, মুলুকদাসী।।"

এই প্রবর্তকবাদী সহজিয়াদের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবেরা নাম দিয়েছিলেন পাষণ্ড। এদের ধর্মাচরণের বিরুদ্ধে কলমও ধরেছিলেন। 'পাষণ্ডীদলন'-এর মত গ্রন্থ লিখে ধিক্কার জানানো হয়েছিল তাদের আচারমার্গকে। পাশাপাশি নিষ্ঠাবান শরিয়তী ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন লালনশাহীর মত এবং অন্যান্য ফকিরি বা বাউল তত্ত্বকে। তাদের তারা চিহ্নিত করেছিলেন 'বেশরা' বলে। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ব্রাহ্মণরা শুধুমাত্র গ্রন্থ রচনা করে ক্ষান্ত হলেও মুসলমানরা জারি করেছিল বাউল ধ্বংসের ফতোয়া।[৪]

এই সামাজিক এবং ধর্মীয় নিষেধ উপেক্ষা করেই দলিত শ্রেণির ধর্ম ভাবনার আরম্ভ। তারা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও শাস্ত্রবিরোধী। সাংগঠনিক ধর্মের অনুসারীরা যখন তাদের ধর্মদ্রোহী বলে দোষারোপ করে, তখন তারা শাস্ত্রের বাণী দিয়েই শাস্ত্রকে খন্ডন করেন। তারা ইহবাদী দেহ সাধক, অনেক আদিম ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী; মানবীয় প্রজননেন পদ্ধতির অনুরূপ হিসেবেই বিশ্বসৃষ্টিকে বুঝতে চেষ্টা করেন। এই শ্রেণির মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে রয়েছে লোকায়ত দর্শন, যা মূলত বস্তুবাদী। জীবনের মূল উৎস হিসেবে তাঁরা বরণ করে নেন মাটি ও মানুষ, জমি ও বীজ, নারী ও পুরুষ, উর্বরতা ও প্রজনন কে। তাঁদের সাধনা কায়া সাধনা। নরনারীর সহজ সরল যৌন ধর্মকে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করেন। বাউল-বৈষ্ণব-বৌদ্ধ-সহজিয়া অন্যান্য লোক ধর্ম সম্প্রদায়ের অনুসারীরা বিশ্বাস করেন প্রকৃতির সকল গুপ্ত শক্তির সঙ্গে দেহের গুপ্ত শক্তির নিবিড় যোগ রয়েছে। দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাতে পারলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তার অনুকূলে আসবে।[৫]

শাস্ত্র নির্ভর প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ধর্মের গন্ডির বাইরে কতিপয় আদিম বিশ্বাস - সংস্কার মেনে যোগতন্ত্র নির্ভর ইহবাদী ও মানবিক যে দেহতাত্ত্বিক গুহ্য সাধনা, তার যাবতীয় ক্রিয়াকরণই লোকধর্ম। বাউলরা ধর্ম অর্থে ধারণ করা বা মূল বস্তুরক্ষা করার কথা বলেন। এদিক থেকে তাদের ধর্ম পরলোক কেন্দ্রিক নয়। দুদ্দু শাহ্‌র গানে বস্তুবাদী সাধনার কথা আছে এভাবে :

"যে বস্তু জীবনের কারণ
তাই বাউল করে সাধন
জীবনই পরম নিরূপণ
বাউলেরা কয়।" (দুদ্দু শাহ/ এস. এম. লুৎফর রহমান, পৃ. ৮৫)

এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির রহস্যের অনুসন্ধান চলে মানব দেহের রহস্যের মধ্যে। মানব দেহই বিশ্ব প্রকৃতির সংক্ষিপ্তসার বলে মনে করা হয়। 'যা আছে দেহভাণ্ডে, তাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে' — এই একই সুর ধ্বনিত হয় বাংলার ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর বলিষ্ঠ শাখা মতুয়া ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাদের ধর্ম-সাধনার মূল কথা হল — 'হাতে কাম মুখে নাম।' তারা দেহ সাধনা করে এভাবে :

"যেজন রক্ষা করে পিতৃধন,

সেই সে ভবে বাপের বেটা বিচক্ষণ।
পিতৃধন না করে যতন, ওসে অধোপাতে অভাজন।" (শ্রীশ্রী হরিসঙ্গীত / অশ্বিনী গোঁসাই, পৃ. ৬৫)

এই ব্রাত্য ধর্মসম্প্রদায় গুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি এভাবে পরিস্ফুট :

i. শাস্ত্রীয় বিধি তথা বৈদিক আচার প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে নতুন ভাবনার উন্মেষ;

ii. বিভিন্ন শাস্ত্রের মানবীয় আচার আচরণ গুলি অকপটে গ্রহণ;

iii. জাতপাতের বিরুদ্ধে সোচ্চার;

iv. ভূগোলের বেড়া নেই, ধর্মের বেড়ি নেই, মানুষই উপাস্য;

v. অনুমানের চেয়ে বর্তমান, পরলোক থেকে ইহলোক, ঈশ্বরের চেয়ে গুরু, আত্মার চেয়ে দেহ, মন্ত্রের চেয়ে সঙ্গীতের গুরুত্ব অধিক;

vi. নারী-পুরুষের সম্মিলিত সাধনা;

vii. প্রতিবাদী চেতনা থাকে, যা অসহায় মানুষের কাছে ভিন্নতর এক পথের নিশানা স্বরূপ;

viii. আচার থাকলেও যুক্তিরই প্রাধান্য।

বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় ধর্ম তার অনুশাসন কে যখন বল প্রয়োগ কিংবা কৌশলে সাধারণ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয়, তখন লোক সাধারণ ভেতরে ভেতরে তার নিজস্ব ধর্মকেই লালন করে যেতে থাকে। আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে নিজের গোষ্ঠীর মধ্যেই একজন হিরো তৈরি হোক; যিনি এই নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। এক সময়ে তাদের সেই অভীপ্সা পূর্ণ হয়, উঠে আসে এক দরদী মানুষ। সেই মানুষকেই লোক সাধারণ অবতার আখ্যা দেয়। তার শিক্ষাতেই ধর্ম নবতর রূপ পায়। উৎপিড়িত বঞ্চিত লোকজন দলে দলে সেই ধর্মের অনুসারী হয়। কিছুদিন পরে অবস্থাটি আবার উল্টে যায়, সেই নবরূপ প্রাপ্ত লোক ধর্মটিকে ও উচ্চবর্ণের অধিপতিরা অধিকার করে নেয়।[৮]

নিম্নবর্ণের ধর্মধারার মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষ। বিশেষ করে গ্রাম সমাজের অশিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত মানুষদের সবরকমের সংস্কার থেকে মুক্ত করে নৈতিক উন্নয়ন ঘটানো। এই সুবাদে জাত ব্যবস্থার কঠোরতা থেকে সমাজকে মুক্তির দিশা দেখায় ধর্ম সম্প্রদায় গুলি। এ প্রসঙ্গে সাধক কবি লালনের একটি পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

"ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই
হিন্দু কি জবন বলে জাতের বিচার নাই।" (দলিত সাহিত্য পত্রিকা, সম্পা: অধীর বিশ্বাস, পৃ. ১২০)

এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ভক্তি সকলকে সাম্যের দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। ইসলামে সবাই যখন কাতার দিয়ে নামাজ পড়ে, তখন তাদের আমরা শ্রেণিকরণ করতে পারিনা। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাশেই হয়তো কোনও কৌলিন্যহীন ব্যক্তি নামাজ পড়ছেন, জ্ঞান ও কর্মের দিক থেকে তাদের সম মানে বিরাজ করা কিংবা একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু ভক্তি তথা ধর্মীয় ক্ষেত্রে তারা একই আসনে আসীন। দলিত শ্রেণির প্রতিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই সাম্যবাদেরই প্রকাশ লক্ষিত হয়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালের নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব তোতারাম এই প্রতিবাদী ধর্মগোষ্ঠীগুলিকে বর্জন করার কথা বলেছেন :

“আউল্ বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।
সহজিয়া সখীভাবকী স্মার্ত জাত-গোসাঁই।।
অতি বড়ী চুড়াধারী গৌরাঙ্গ নাগরী।
তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি।।” (বৈষ্ণবইজম ইন বেঙ্গল, পৃ. ১৫০)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, উল্লিখিত তেরোটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌরনাগরী ও জাতগোঁসাই-এর উল্লেখ আছে, যা তোতারামের আপন ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত। উল্লেখ্য তারাই জাত বৈষ্ণব, যারা মহাপ্রভুর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পূর্ব সমাজ ত্যাগ করে ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়েছিল। এদের মধ্যে দলিত তথা শূদ্র সমাজের লোকই বেশি। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর এই শূদ্র শ্রেণি ব্রাত্য হয়ে পড়ে বৈষ্ণবদের চোখেই। অপমানিত এই জনগোষ্ঠী পরবর্তীকালে ভক্তি আন্দোলনের ধারাকে পুষ্ট করে স্বতন্ত্র ভাবে।

তোতারাম এই অপসম্প্রদায় গুলির প্রতি ছুঁত মার্গ প্রকাশ করেও তাদের অবদলিত করতে পারলেন না, বরং দ্রুত তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল এবং বাংলার গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। এই সংখ্যা বৃদ্ধিতে খেদ প্রকাশ করে তোতা বললেন :

“পূর্বকালে তের ছিল অপসম্প্রদায়
তিন তেরো বাড়ল এবে ধর্ম রাখা দায়।” (চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব / ননীগোপাল স্বামী, পৃ. ১৮৫)

তের থেকে উনচল্লিশ হয়ে দাঁড়ালে আমরা তার ব্যপ্তি সহজেই অনুমান করতে পারি।[৯]

এই ছোট ছোট সম্প্রদায়ে অজস্র দীক্ষিত মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল ছিল। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাতে তারা সম্পৃক্ত। উচ্চ সমাজের সামাজিক ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক শোষণ-শাসন তাদের সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এই বর্ণরিক্ত মানুষদের পাহাড় প্রমাণ প্রতিবন্ধকতা দূর করতে স্বধর্মীয় কোনও গুরু সামনে এসে দাঁড়ান। গোটা অঞ্চলের মানুষ তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন মনোভাব অবিস্মরণীয়।

ছোট ছোট ধর্মসম্প্রদায়ের ভক্তকুল তাদের গুরুকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পুজো করে এবং তার মধ্যেই অবতার শ্রীচৈতন্য এবং চৈতন্যের অবতার বীরভদ্র:

“বীরভদ্র রূপে পুঃণ গৌর অবতার
যে না দেখেছে গৌর সে দেখুক একবার।”[১০]

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মধ্যেও এমন জনশ্রুতি লক্ষিত হয়। তাদের বিশ্বাস গৌরাঙ্গ পুরীর জগন্নাথের মধ্যে লীন হবার পর গৃহী মানুষকে বৈরাগ্য ধর্ম শেখাতে আবির্ভূত হলেন আউলচাঁদ হয়ে :

“কৃষ্ণচন্দ্র-গৌরচন্দ্র আউল চন্দ্র
তিনেই এক একেই তিন।” (বাংলার গৌণ ধর্ম / সুধীর চক্রবর্তী, পৃ. ২২)

আবার আউল চন্দ্রের মৃত্যুর পর দুলাল চন্দ্রকে একইভাবে শ্রীকৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গের

অবতার রূপে মান্যতা দেওয়া হয় এভাবে :

"তিন কে রূপ
শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র শ্রী গৌরচন্দ্র ও শ্রী দুলালচন্দ্র" (বাংলার গৌণ ধর্ম / সুধীর চক্রবর্তী, পৃ. ২৩)

সাহেবধনী ধর্মসম্প্রদায়ের পূর্ব সূত্রে শ্রীকৃষ্ণ বা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নেই, রয়েছে শ্রীরাধা:

"সেই ব্রজধামের কর্তা যিনি
রাইধনী সেই নামটা শুনি
সেইধনী এই সাহেবধনী।" (বাংলার গৌণ ধর্ম / সুধীর চক্রবর্তী, পৃ. ২৩)

আবার বলরাম হাড়ির শিষ্যকুলে বলরামকে শ্রীরাম চন্দ্রের অবতার বলে বিশ্বাস করেন। বঙ্গের আরও এক বলিষ্ঠ ধর্ম হরিচাঁদ ঠাকুর প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মানুসারীদের বিশ্বাস—হরিচাঁদ ত্রেতা যুগে ছিলেন রামচন্দ্র, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিতে গৌরাঙ্গের ঐতিহ্য পুষ্ট লীলাবিভূতিরই পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ :

"সকল হরণ করে তারে বলি হরি।
রাম-হরি, কৃষ্ণ হরি, শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।" (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত / তারক সরকার, পৃ. ৪)

মতুয়া ভক্তের বিশ্বাস হরিচাঁদ তার পুত্র গুরুচাঁদের দেহে মিশে গিয়েছেন। তিনি আসলে মহাকাল মহেশ্বর। এই সুবাদে গুরুচাঁদ রাম-কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গও শিবের সম্মিলিত রূপ।

ইতিহাসের গতি চক্রে একদিন অধিকার বঞ্চিত মানুষের মধ্যে যাগ-যজ্ঞ বেদবিরোধী প্রতিবাদী ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল। নবম দশম শতকে ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজের কঠোর অনুশাসনে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল অন্ত্যজবর্গের উপর। মুসলমান শাসনের দীর্ঘ ছয় শতাব্দী অতিক্রম করে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে ইংরেজ শাসন কালে ও বৃহত্তর এই অবহেলিত দলিত জন গোষ্ঠীকে ভাগ্যফল ও জন্মান্তরের দোহাই দিয়ে নিমর্জিত করা হয়েছিল গভীর হতাশা ও চরম দুর্দশার ঘন অন্ধকারে। সামাজিক অবক্ষয়ের এই পটভূমিতে লোকায়ত সমাজের মুক্তি ও জাগরণের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন স্বতন্ত্র্য ধর্মের আঙ্গিক নিয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের উদার আকাশ থেকে উদ্ভূত হয় মতুয়া ধর্মের। প্রবর্তক শ্রীশ্রী হরিচাঁদ ঠাকুর। কথিত চৈতন্যদেব ও গৌতমবুদ্ধের ইচ্ছাতে পতিত উদ্ধারের জন্যই তার জন্ম। নিম্ন জাতির জন্য তাঁর ধুলার ধরণীতে আবির্ভাব; তাই তিনি অবতার। এ প্রসঙ্গে:

"নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার।
অতি নিম্নে না নামিলে কিসে অবতার।।" (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, ১ম সংস্করণ / তারক সরকার, পৃ. ১৫)

নিম্নবর্ণের মানুষের ধর্মচারণায় পথকে সুগম করতে একদিকে যেমন হাতে কাম মুখে নাম তথা ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় আনতে সচেষ্ট হলেন, তেমনি সর্বপ্রকার জাতিভেদ উপেক্ষা করে উদার ধর্মভাবনার মুখোমুখি দাঁড়ালেন হরিচাঁদ। বৈদিক প্রথা কে অস্বীকার করতে তার দৃপ্ত উচ্চারণ:

"কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদ বিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।" (শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত, ১ম সংস্করণ / তারক

সরকার, পৃ. ১৩৪)

মতুয়াদের মত অনেক লৌকিক বৈষ্ণব সম্প্রদায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে সে সময়ে গড়ে উঠে ছিল। ময়মনসিংহ অঞ্চলে যে সময়ে গুরুসত্য ও আগল শঙ্কর সম্প্রদায়ের কথা শোনা যেত, যা এখন আর শোনা যায় না। সিলেট অঞ্চলে এখনও ঠাকুরবাণী সম্প্রদায় চিরবিরাজমান অস্তিত্বমান। এই ধর্মের প্রবর্তক ঠাকুরবাণী। সতেরো শতকের শেষ দিকে তার আবির্ভাব। এক দিকে বৈষ্ণবীয় ভাব, অন্যদিকে ইসলামের উদার দিকগুলিকে সমন্বিত রূপ দিলেন ঠাকুরবাণী, সেই সঙ্গে শাহজালালের প্রতি ছিল তার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। এ সম্প্রদায়ের শিষ্যরা তার গুরুজিকে কখনও কখনও হজরত ঠাকুরবাণী বলেও সম্বোধন করে।

উনিশ শতকের প্রথম মধ্যভাগে বসন্ত সাধু চৈতন্য ও তার স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে আরাধ্য করে প্রবর্তন করেন স্বতন্ত্র্য এক উপাসক সম্প্রদায়। সমাজের অনেক প্রচলিত রীতি-নীতিকে অমান্য করেছিলেন তিনি। বসন্ত সাধু তাঁর স্ত্রীকে মা বলে ডাকতেন আর শিষ্যরা তাকে ডাকতেন দাদা বলে। এই সুবাদে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় মা-দাদা সম্প্রদায়।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রাজবংশীদের মধ্যে যে বিদ্রোহী লৌকিক ধর্ম সম্প্রদায়টির বিস্তার ঘটেছিল, তার নাম ক্ষেপা দল। রাজশাহীর নওয়াপাড়া থেকে রাজবংশী সূর্য নারায়ণ সাধু ও পরাণ সাধু শেষপুর এলাকায় এসে ক্ষেপা দলের প্রচার শুরু করেন। তারা কঠোরভাবে একেশ্বরবাদী, দেবদেবীতে অবিশ্বাসী এবং জাতিভেদ বিরোধী। এদের সংগঠিত হতে দেখে সে সময়কার বর্ণ হিন্দুরা রীতিমতো ভীত হয়ে পড়ে।

ময়মনসিংহ অঞ্চলের আদিবাসী সহ নিপীড়িত কৃষকবর্গ এক সময়ে সে লৌকিক ধর্মটিকে আশ্রয় করে বিপ্লবী হয়ে ওঠে তার নাম পাগল পন্থা। প্রবর্তক করম শাহ্। পাগল-পন্থীদের মতে সমস্ত জমির মালিক আল্লাহ। সেই জমিকে সন্তানসম লালন করে যে কৃষক সেই তো জমির ফসলের ন্যায্য অধিকারী। তাদের মতে আল্লার সৃষ্টির মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই, উঁচু-নীচু নেই। সব মানুষ ভাই ভাই। তাই করম শাহের ভক্তরা তাকে সম্বোধন করে ভাই সাহেব বলে। গ্রামাঞ্চলের কৃষক শ্রেণির যাপনের সঙ্গে তাদের ধর্ম সঙ্গতিপূর্ণ।[11]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আনন্দচন্দ্র নন্দী (১৮৩২-১৯০০) প্রবর্তন করেন সর্ব সাধনতত্ত্ব প্রণালী। এ ধর্ম ব্রাহ্মধর্মেরই লৌকিক রূপ এখানে নিম্নবর্ণের মানুষের আধিক্য লক্ষ করা যায়। বাউল এবং মতুয়া সম্প্রদায়ের মতো এখানেও দেহ সাধনার কথা সুস্পষ্ট আকারে প্রকাশিত :

"দেহতেই সর্ব বিদ্যা সকল দেবতা
সর্বতীর্থে বিরাজিত আছেন পিতামাতা।" (গণমুক্তি পত্রিকা, বাংলার লোকধর্ম সংখ্যা / সম্পা: উৎপল বিশ্বাস, পৃ. ৫৩)

কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউসচাঁদ ঠাকুর। দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি ধর্ম বিপ্লবের প্লাবন বইয়ে দেন বাংলায়। জগৎকর্তাকে ভজনা করা হয় বলে এই সম্প্রদায়ের নাম 'কর্তাভজা'। মানুষ রূপেই ঈশ্বর মানুষের কাছে থাকেন। সেই মানুষ বর্তমান। গুরুই নরদেহী ঈশ্বর। তিনি সহজ নিধি। মালা তিলক দাড়ি-চুল টুপি ইত্যাদি পরিচ্ছদের প্রয়োজন নেই, ঈশ্বরের ভাব থাকবে অন্তরে।

পূর্ববঙ্গের নিম্ন জলাভূমি বরিশাল অঞ্চলে প্রচারিত হয় পাগলচাঁদের ধর্মমত। প্রবর্তক

রাধানাথ মিস্ত্রী। কল্পিত ঈশ্বরকে নয়, পিতামাতাকেই ঈশ্বরের রূপে কল্পনার কথা বলা হয়েছে। জাতিভেদ যেমন তিনি মানতেন না, তেমনি নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথাও বলা হয়েছে এ ধর্মে। তাঁর প্রবর্তিত বিবাহ ব্যবস্থায় নারী যেরূপ ধুপধুনা দিয়ে স্বামীকে দেবতা রূপে বরণ করবে, তেমনি স্বামীও দেবী রূপে স্ত্রীকে পুজো করবে :

"নিজনারী দিব্যজ্ঞানে সম্মান করিবে।
আপনি সাজিবে দেব পরমানন্দ পাবে।।
সম-অধিকার তার তাই অর্ধাঙ্গিনী।
সর্ব কর্মে তুল্য দাবী মনে রেখ মানি।।" (গণমুক্তি পত্রিকা, বাংলার লোকধর্ম সংখ্যা / সম্পা: উৎপল বিশ্বাস, পৃ. ৮৫)

পাগলচাঁদ ব্রাহ্মণ বর্জিত মাতৃ ভাষায় বিয়ের রীতি চালু করেন। তার ধর্মমতে বিধবা বিবাহ ব্যবস্থা চালু ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিয়ে দিয়ে নজির স্থাপন করেন।[১২]

বাংলায় দলিত ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বলিষ্ঠ ধারা সহজিয়া মতবাদ। এর প্রবর্তক তিলকরাম শিরোমনি। ১১৮৪ বঙ্গাব্দে শ্রীহট্টে তাঁর আবির্ভাব। অস্পৃশ্যতা দুরীকরণের মধ্য দিয়ে সমাজে সাম্যের রূপ প্রতিষ্ঠা ছিল এ ধর্মের প্রধান লক্ষ্য। সেসময়ে আরও একটি গৌণ ধর্ম প্রচলিত ছিল এ অঞ্চলে। সেটি হল জগন্মোহিনী সম্প্রদায়। প্রতিষ্ঠাতা জগন্মোহন গোঁসাই। এ সম্প্রদায়ের জাত বিচার নেই। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের মত তারা 'গুরুসত্য' মহাবাক্যে বিশ্বাসী। অনেকে তাঁদের মহাযানী বৌদ্ধদের একটি বিকৃত শাখা বলে মনে করেন। তবে তারা যে স্বতন্ত্র অভিনব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে দক্ষিণ মধ্য বাংলায় রাই রসরাজ হিন্দুধর্মের বৃত্তের মধ্যে একটি লৌকিক মতবাদের সূচনা করেন। উঁচু নীচু ভেদাভেদ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি ভক্তকূলকে একত্রিত করে এক শুদ্ধ জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করেন। ধর্মীয় ভাবাবেগের দ্বারা চালিত হলেও সমাজ সংস্কারের প্রতি রাই রসরাজের ধর্ম দর্শনের ঝোঁক লক্ষিত হয়।

ঊনিশ শতকের সূচনায় বাংলায় ব্রাত্য সমাজের ধর্মযাজক হিসেবে উঠে আসে বলরাম হাড়ির নাম। তার অনুসারীরা বলাহাড়ি নামে খ্যাত। এ ধর্ম অবতারবাদে বিশ্বাস রাখে না। ১৮/১৯ শতকে উদ্ভূত অন্যান্য লৌকিক কর্মের মত নারী সঙ্গী নিয়ে কায়া সাধনা বা মৈথুর তাদের ধর্ম নয়; আবার তাদের ধর্ম চৈতন্য প্রভাবের চিহ্ন নেই। 'যাহা দেখিনি নয়নে/তাহা ভজিব কেমনে।' এইটাই বলাহাড়িদের মুল মন্ত্র। সে কারণে তাদের একমাত্র উপাস্য বলরাম। কিন্তু শুধু মুখে হাড়ির নাম নিলেই তাকে পাওয়া যাবে না, তাকে পেতে গেলে ত্যাগ করা চাই দেখাদেখি আর জাতাজাতির ভেববুদ্ধি :

"অধরা মানুষ ধরবি যদি
আগে ছাড়ো বৈদিক বিধি
তবে মিলবে রত্ন নিধি।" (হাড়ি ধর্ম / কর্ণ ধর, পৃ. ৩৪)

নিম্নবর্ণের ধর্ম সাধনার আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সাধন বিস্তার। গ্রামীন মানুষের সুরের সাধনা সহজাত। মাঠে-ঘাটে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অথবা সারাদিনের কাজের শেষে নিজেদের গোষ্ঠীগত ধর্ম সাধনার অনুসঙ্গে রচিত সঙ্গীতের মধ্য

দিয়ে পূজিত হন তার আরাধ্য। কথা সেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারেনা, সুর সেখানে সহজগম্য। তাছাড়া প্রতিবাদের কথাও সাধারণভাবে বলার চেয়ে রূপকের রাঙতায় মুড়ে পরিবেশন করা অনেক নিরাপদ। একথা স্বীকার করতেই হবে, বাউল ধর্মের যে বিস্তার তার মূল বাহন সঙ্গীত। সিরাজ সাঁই, লালন, গগন হরকরা, দুদ্দু শাহ, শাহজালালের মত অগণিত মরমী সাধক তাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পুষ্ট করেছে ভক্তির ধারাকে। সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ভক্তি সাধনার বিস্তার লক্ষিত হয় মতুয়া ধর্মে। তারক সরকার অশ্বীনী গোঁসাই সহ হরিচাঁদ—গুরুচাঁদ উত্তর মতুয়া সঙ্গীতকারেরা কথা আর সুরকে যে উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন, তা বর্তমান সময়ে মাইল ফলক। কর্তাভজা, সাহেবধনী বলা হাড়িসহ অগণিত লোকধর্ম তথা দলিতবর্গের ধর্ম সাধনার প্রসারের ক্ষেত্রে সঙ্গীতের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলার ধর্মীয় সামাজিক ইতিহাসে দলিতের ভক্তি সাধনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য; কারণ তা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় প্রসার শুধুমাত্র আধ্যাত্ম বাতাবরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, লোকায়ত মানুষের জীবনের সঙ্গে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে বিশিষ্ট গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। এই ধর্ম সম্প্রদায় গুলি বিশিষ্ট অর্থে নিপীড়িত উপেক্ষিত মানুষের আত্মজাগরণের ভূমিকা পালন করেছে বহুমুখী সমাজ-সংস্কারের প্রয়াস-প্রচেষ্টার মাধ্যমে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই সব লোকায়ত ধর্মান্দোলন গুলির মাধ্যমে বিশ্বের বহু রাষ্ট্রায়ত্ত সামাজিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।[১৩]

লৌকিক ধর্মের অনুসারী হিসেবে বাউল দর্শনকে স্বতন্ত্র্য হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে বাউল একটি বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে। বাউলের সাধনা ও সঙ্গীত কয়েক শতাব্দী ধরে মানুষের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ও রসতৃষ্ণা মিটিয়ে আসছে। বাউল আসলে মিশ্র মতবাদ — বৌদ্ধ সহজিয়া ইসলামি সুফি ও বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে।[১৪] শাস্ত্রধারী হিন্দু আর শরীয়ত পন্থী মুসলমান উভয়ের কাছে তারা অবজ্ঞা-নিন্দা-বিদ্বেষ অর্জন করেছে। স্বল্প পরিসরে লালনপন্থীদের এভাবে চিহ্নিত করা যায় :

i. তারা ইহবাদী, পূর্ব-পরজন্মে ও জাতিভেদে অবিশ্বাসী;

ii. বস্তুই তাঁদের কাছে আত্মা, বস্তুর মধ্যেই অমৃতের সন্ধান;

iii. দেবতা, অপদেবতা, মূর্তিপূজা না করে জীবন্ত মানুষকেই ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা। এর নাম মানুষতত্ত্ব।

এই ধর্মসাধনার মধ্যে রয়েছে সমন্বয়বাদ। বর্ণ বিভাজনের উর্দ্ধ তাদের সাধন পথ। বাংলা জল-মাটিকে আশ্রয় করেই এই লোক সাধারণ উদার মনুষ্যত্বের সাধনা করেছে। উচ্চবর্ণের সমাজপতি ও ধর্মাচার্যরা যখন হিন্দু-মুসলমানের ভেদরেখা সুস্পষ্ট ও অমোচ্য করে তুলেছেন, সমাজের স্তর বিন্যাস ও জাত-পাতের বিধান কঠোর থেকে কঠোরতর করে তুলেছেন, তখন নিম্ন বর্ণের ধর্মসাধনার মধ্য থেকে জাতি পরিচয় বিলোপের স্লোগান উঠেছে লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ্‌র গানে :

“বামুন বলে ভিন্ন জাতি
সৃষ্টি কি করেন প্রকৃতি

তবে কেন জাতির বজ্জাত করে এমন ভাই।" (দুদ্দু শাহ / এস. এম. লুৎফর রহমান; পৃ. ৮৫)

লালন শাহ আরও একধাপ এগিয়ে এসে জাতিভেদের শক্ত দেওয়ালে আঘাত হানেন সঙ্গীতকে হাতিয়ার করে :

"ছুন্নত নিলে হয় মুসলমান
নারীলোকের হয় কী বিধান
বামুন চিনি পৈতায় প্রমাণ
বামনী চিনি কোন ভাবে।" (লালনের গান / অভয় দেব, পৃ. ১৪)

দলিতবর্ণ তাদের ভক্তির ধারাকে শুধুমাত্র তত্ত্বের মধ্য দিয়ে জাতিভেদ বিলোপ আর সাম্যের কথা বলেনি বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার প্রয়োগ ঘটিয়েছে মাঠ-ঘাট, বন-বাদাড় পেরিয়ে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত।

তথ্যসূত্র :

১. কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, লোকধর্মের আলোয় প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, উৎপল বিশ্বাস (সম্পা.) গণমুক্তি ৯ম উদ্যোগ, মার্চ, ২০০৮ ঢাকা, পৃ. ১৩
২. শক্তিনাথ ঝা, বাউল ফকির পদাবলী, ১ম খণ্ড, মন ফকিরা, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ৭
৩. সুধীর চক্রবর্তী, বাংলার গৌণধর্ম, পুস্তক বিপণি, ১ম পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ২০
৪. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, দ্বিতীয় খণ্ড, নিউ এজ, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ৯৪-৯৫
৫. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৯৪
৬. শক্তিনাথ ঝা বস্তুবাদী বাউল, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ. ৬
৭. এস. এম লুৎফর রহমান, দুদ্দু শাহ, বাঙলা আকাদেমি, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৭৯
৮. যতীন সরকার, বাংলার লৌকিক ধর্মের ধর্মান্বেষণ, উৎপল বিশ্বাস, (সম্পা.) পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৬
৯. সুধীর চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত পৃ. ৪৬
১০. সুধীর চক্রবর্তী, পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ২৩
১১. ভেলাম ফন স্রেন্ডেল, ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও মুনতাসির মামুন (সম্পা.), বাংলাদেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, ঢাকা ১৯৮৬ পৃ. ৮২
১২. নকুল মল্লিক, খেজুরতলার পাগলচাঁদের ধর্মমত, উৎপল বিশ্বাস (সম্পা.) পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৮৫
১৩. নন্দদুলাল মোহান্ত ভূমিকা মতুয়া আন্দোলন ও দলিত জাগরণ, অন্নপূর্ণা, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, ২০০২,
১৪. আবুল হাসান চৌধুরী, বাউলধর্ম: চালচিত্রের সন্ধানে, উৎপল বিশ্বাস (সম্পা.), পূর্বে উল্লিখিত, পৃ. ৫৫